



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 181 - 186

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিলাদিত্যে কৈশোরকালীন মনস্তত্ত্ব

কৃষ্ণময় দাস

গবেষক, বাংলা বিভাগ

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: krishnamoydas@gmail.com

 0009-0008-4744-0333

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Psychology,
Behavior,
Needs, Conduct,
Characteristics.

Abstract

Abanindranath Tagore's story 'Shiladitya' features three adolescent characters. Through an analysis of the behavioral aspects of these characters, we will attempt to understand the characteristics and psychology of adolescence. Abnormalities are evident in the characters' behavior. In searching for the reasons behind this unusual behavior, we will delve into the world of psychology. We can examine how the characters in the story are influenced by the psychological 'theory of needs'. The story's characters can be analyzed to understand how needs influence an individual's behavior. According to psychology, the fulfillment of needs has a positive impact on behavior, while the non-fulfillment of needs has a negative impact. We will apply the theory of needs to the adolescent characters in the story. The story demonstrates the kind of mentality at play behind Subhaga's desire to live, her longing for death, her desire for a child, and her fear of death. Gayeb's behavior changes due to his lack of paternal identity. We will discuss how psychologically sound Gayeb's angry behavior is.

Discussion

১৯০৯ সালে প্রকাশিত 'রাজকাহিনী' ইতিহাসের ৯টি গল্প সংকলন নয়; এ যেন রূপকথার মায়াজাল। 'রাজকাহিনী'তে তিনি ইতিহাসের ভগ্নস্তূপের প্রতিটি পাথরে সঞ্চর করেছেন প্রাণের স্পন্দন। রূপকথার কল্পনার বলে ইতিহাসের পাতা থেকে ঘুমন্ত চরিত্রগুলো তুলে এনে জীবন্ত করে তুলেছেন। জেমস টডের এর লেখা 'Annals and Antiquities of Rajasthan' বইটি থেকে সংগৃহীত ইতিহাসের কাহিনীর সাথে কিশোর মনোরঞ্জনের উপাদানের সন্নিবেশ ঘটিয়ে শিশু-কিশোর পাঠ্য করে তুলেছেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইতিহাসের শুষ্ক ধূলি ধূসরিত গল্প শোনাতে চাননি তাইতো ভাষা দিয়ে রূপকথার ইন্দ্রজাল রচনা করে ইতিহাসের গল্পকে নতুন মাত্রা দান করেছেন। 'বাংলা লেখক ও কবি' বইটিতে প্রথমথানাথ বিশী লিখেছেন—

“লেখক ঐতিহাসিকের অণুবীক্ষণ ফেলিয়া রূপকথার দূরবীক্ষণ চোখে লাগাইয়াছেন। ফলে কাছের জিনিস তথ্য বর্জন করিতে করিতে দূরে সরিয়া গিয়া রূপকথার রাজ্যে রূপান্তরিত হইয়াছে।”

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ‘রাজকাহিনী’র প্রথম অংশটির নাম হল ‘শিলাদিত্য’। এই কাহিনীটির মধ্যে প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে অনাথ বিধবা সুভাগার একটি ছেলে ও একটি মেয়ের পরিচয় পাই। গায়েব, গায়েবী ও সুভাগা ‘শিলাদিত্য’ কাহিনী অংশের কৈশোরকালের প্রতিনিধি। কাহিনীর প্রথম অংশে দেখতে পাই বল্পভীপুরের সূর্য কুণ্ড নামে পবিত্র কুণ্ডর একাধারে প্রকাণ্ড সূর্যমন্দিরে এক অতিবৃদ্ধ পুরোহিত বাস করতেন। সূর্য মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিতের কাছে এসে আশ্রয় নেয় বালিকা সুভাগা। পুরোহিত সুভাগাকে ভগবান আদিত্যের সেবা দাসীরূপে নিয়োজিত করেন। নির্জন সঙ্গীহীন বিদেশে সুভাগার একাকী দিন কাটে না। যে দরিদ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অনাথিনী সুভাগাকে আশ্রয় দিয়েছিল সেও আজ নেই। শ্রাবণ মাসের দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশে সুভাগা মন্দিরের সমস্ত দুয়ার বন্ধ করে প্রদীপ জ্বালিয়ে সূর্যমূর্তির সামনে সূর্যমন্ত্র উচ্চারণ করে এবং সূর্যদেবের দর্শন লাভ করে ‘একটি ছেলে ও একটি মেয়ে’ প্রার্থনা করে। সূর্যদেবের বর পুত্র-পুত্রী হল গায়েব (পরবর্তীতে শিলাদিত্য) ও গায়েবী। এই হল কাহিনীটির প্রথম অংশ। এখানে আমরা কিশোরী সুভাগার মনস্তত্ত্বের সাথে পরিচিতি লাভ করব।

কাহিনীর প্রথম অংশটিতে অনাথ বিধবা সুভাগার পুত্র-পুত্রী লাভের পূর্ব পর্যন্ত সুভাগাকে আমরা কিশোরী বলতে কোনো বাধা নেই। সুভাগা নামটির পূর্বে বিধবা বিশেষণটি ব্যবহার আমাদের মনে প্রশ্ন তোলে সুভাগা কিশোরী কি না? যে প্রেক্ষাপটে কাহিনীটি রচিত হয়েছে সেই প্রেক্ষাপটে খুব অল্প বয়সেই মেয়েদের বিয়ে হত। বিয়ের রাতে সুভাগা বিধবা হয়েছে এবং পরিবার-পরিজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছে। লেখক স্পষ্টই কাহিনী অংশে সুভাগাকে ‘ব্রাহ্মণ বালিকা’ বলে উল্লেখ করেছেন সুতরাং তাকে কিশোরী বলতে আর কোনো বাধা থাকে না। কিশোরী সুভাগা সূর্যদেবের কাছে বর প্রার্থনা করে, -

“প্রভু, আমি পতিপুত্রহীনা, বিধবা অনাথিনী, বড়ই একাকিনী, আমাকে এই বর দাও যেন এই পৃথিবীতে আমার আর না থাকতে হয়।”^২

যেহেতু দেবতার বরে কারোর মৃত্যু হয় না, দেবতার অভিশাপে মৃত্যু হয় না তাই সূর্যদেব সুভাগাকে অন্য একটি বর প্রার্থনা করতে বললে সুভাগা সূর্য দেবতাকে প্রণাম করে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে প্রার্থনা করে। সুভাগার মৃত্যু প্রার্থনা এবং মাতৃত্বের স্বাদ আস্বাদনের ইচ্ছা - এর পিছনে কি ধরনের মনস্তত্ত্ব কাজ করছে তা বোঝার চেষ্টা করি।

সুভাগা সূর্য দেবতার চরণে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চেয়েছে। এই মৃত্যু কামনার পিছনে রয়েছে তার অতীতের জীবন। মনোবিজ্ঞানের মতে অতীতের ঘটে যাওয়া ঘটনা ব্যক্তির আচরণকে সক্রিয়ভাবে প্রভাবিত করে। আমরা সকলে ব্যক্তিগত জীবনে অতীত স্মৃতির প্রভাবকে অনুভব করে থাকি। অতীতের অভিজ্ঞতা যদি সুখকর না হয় তা ব্যক্তির আচরণে ঋণাত্মক প্রভাব বিস্তার করে। শিশুরা নিমপাতা মুখে দিলে মুখ তেতো হয়ে যাওয়ায় সে নিমপাতা তৎক্ষণাৎ মুখ থেকে ফেলে দেয় এবং ভবিষ্যতে নিমপাতা মুখে দেওয়া থেকে বিরত থাকে। নিমপাতা মুখে দেওয়াই বিরত থাকার যে আচরণ তা তার অতীতের অভিজ্ঞতালব্ধ। এককথায় বলা যায় ব্যক্তির বর্তমান আচরণ অতীতের অভিজ্ঞতার দ্বারা নির্ধারিত ও পরিবর্তিত হয়। সুভাগার মৃত্যু কামনার মতো আচরণ অতীত অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রভাবিত। সুভাগার বালিকা অবস্থায় বিবাহ হয় এবং বিবাহের রাতে তার স্বামী মারা যায়। মা-বাবা এবং শশুরবাড়ির লোকজন সুভাগাকে আশ্রয় দেয়নি। সদ্য বিধবা হওয়া একজন বালিকার কাছে নির্জন প্রান্তে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন এক দুঃস্বপ্নের মতো। এই দুঃস্বপ্ন তাকে বারবার কুড়ে কুড়ে খেয়েছে তাই একাকিনী বিধবা সুভাগা শ্রাবণ মাসে—

“একা বসে-বসে বাপ মায়ের কথা, শশুরশাশুড়ির নিষ্ঠুরতা, আর বিয়ের রাতে সুন্দর বরের হাসিমুখের কথা মনে করে কাঁদতে লাগলেন— হাই এই নির্জনে সঙ্গীহীন বিদেশে কেমন করে সারা জীবন একা কাটাব।”^৩

বিধবা বালিকা সুভাগা বরের সুন্দর হাসিমুখ দেখতে পায়নি। বরকে সে চোখেই দেখেছে, কাছে পাওয়ার স্বপ্ন তার পূরণ হয়নি - একি কম কষ্টের কথা? সংসারে থাকলেও সুভাগা হয়তো নানা কাজকর্মের ব্যস্ততার মধ্যে কাটিয়ে দিতে পারতো কিন্তু বাস্তব যে বড় কঠিন। শশুরবাড়িতে তার স্থান হয়নি এমনকি নিজের মা-বাবা ও সামান্য আশ্রয়টুকু দেয়নি। আধুনিক মনোবিজ্ঞান বলে খাদ্য-অন্ন-বাসস্থান-নিরাপত্তা এই চারটি ব্যক্তির প্রাথমিক চাহিদা। এই চাহিদার অপূর্ণ থাকলে ব্যক্তির বিকাশ বাধা প্রাপ্ত হয়। নিরুপায় হয়ে সুভাগা আশ্রয় নেয় সূর্যমন্দিরের চালচুলোহীন দরিদ্র পূজারীর কাছে। বৃদ্ধ পূজারীর

কাছে আশ্রয় পেয়ে সুভাগার যেন কুল পেল। নির্জন সঙ্গীহীন বিদেশে অনাথিনী সুভাগার একমাত্র আশ্রয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণও তাকে 'নিঃশব্দ প্রকাণ্ড সূর্যমন্দিরে' একা রেখে বিদায় নিল। নিজের বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি এবং সর্বশেষ আশ্রয়টুকুও তার রইল না। এভাবে বার বার আশ্রয় হারানোর ঘটনা সুভাগাকে একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। তাই আশ্রয়চ্যুত সুভাগা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শেষ আশ্রয় নিতে চেয়েছে সূর্যদেবের চরণপদ্মে।

সূর্যদেব মৃত্যু ব্যতীত অন্যকোনো বর চাইতে বললে সুভাগা একটি পুত্র ও একটি পুত্রী কামনা করে। সুভাগার কাছে এই বর কামনা পক্ষান্তরে আশ্রয়স্থল খোঁজা। যাতে সুভাগা বাকি জীবনটুকু পুত্র-পুত্রীর সান্নিধ্যে কাটিয়ে দিতে পারে। মৃত্যুকামী সুভাগার মনের এই পরিবর্তন হঠাৎ নয়, এখানে কার্যকর অতীতের ইচ্ছা-কামনা বা অভিজ্ঞতা। পূর্বেই বলেছি সুভাগা বালিকা এবং বিধবা, স্বামীকে চোখে দেখা হয়েছে কিন্তু তার সাথে সংসার করা হয়নি। স্বামীর হাসিমুখের কথা মনে করে চোখের জল ফেলে।

“ছেলের পাল, ফুল ছিড়ে, ফল পেড়ে, ডাল ভেঙে চুরমার করত। সুভাগা কিন্তু কাকেও কিছু বলতেন না। হাসিমুখে সকল উৎপাত সহ্য করতেন। গাছের তলায় সবুজ ঘাসে নানা রঙের কাপড় পরে ছোটো-ছোটো ছেলে-মেয়ে খেলে বেড়াত, দেখতে দেখতে সুভাগার দিনগুলো আনমনে কেটে যেত।”^৪

সুভাগা এইসব দেখত আর মনে মনে ভাবত - হাই এই নির্জনে সঙ্গীহীন বিদেশে কেমন করে সারা জীবন একা কাটাতে। এইসকল ঘটনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় সুভাগার মনে মাতৃত্বের বীজ বপন হয়েছিল, কিন্তু স্বামী না থাকায় এই ইচ্ছে পূরণ হওয়া সম্ভব ছিল না। সুভাগার কাছে যখন বর প্রার্থনার সুযোগ আসল তখন সুভাগা একদিকে সঙ্গীহীনতা, আশ্রয়হীনতায় জর্জরিত অন্যদিকে পীড়াদায়ক অতীতের স্মৃতি তাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। তাই সুভাগা প্রথমে মৃত্যু কামনা করেছিল। সূর্যদেবের কাছে একটি পুত্র ও একটি পুত্রী লাভের বর প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আশ্রয়হীনতা ও সঙ্গীহীনতার রিক্ততা থেকে মুক্তি চেয়েছে। এত কিছুর পরেও সুভাগার মনস্কামনা কিন্তু পূর্ণ হয়নি। ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাকি জীবনটা সুখে কাটাতে এমন ভাগ্য সুভাগার ছিল না। পুত্র গায়েব যখন পিতৃ পরিচয় জানার জন্য উন্মত্ত হয়ে ওঠে তখন বাধ্য হয়ে সুভাগাকে সূর্যদেবের আশ্রয় করতে হয়। সুভাগা জানত দ্বিতীয়বার সূর্যদেবকে আশ্রয় করতে তার মৃত্যু অনিবার্য। সেজন্য সুভাগা বারবার গায়েবকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে পিতৃ পরিচয়ে লাভ কি? বহু কষ্ট ভোগের পর সুভাগার জীবনে সুখ শান্তি ফিরে পেয়েছে ছেলেমেয়েকে আশ্রয় করে। অতীতের চাওয়া পাওয়া কিছুটা হলেও ভৃগু হয়েছে নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে। সুভাগা এই পৃথিবীকে বিদায় জানাবার জন্য মোটেই প্রস্তুত না। তাইতো যে সুভাগা একদিন সূর্য মন্দিরে মৃত্যুকে কামনা করে নির্ভয়ে সূর্যমন্ত্র উচ্চারণ করেছিল সেই সুভাগার সূর্যমন্ত্রকে কালসর্পের মতো মনে হয়েছে। কত ব্যথা, কত ভয় নিয়ে বাধ্য হয়ে মৃত্যুকে বরণ করেছে।

সুভাগা সূর্যদেবের আশীর্বাদে পুত্র গায়েব এবং পুত্রী গায়েবীকে লাভ করে। কাহিনীতে গায়েবকে আমরা কিশোর চরিত্র রূপে পেয়েছি। ঘটনার ঘনঘটার মধ্য দিয়ে কিশোর গায়েবের কৈশোরকালের মনস্তত্ত্বগত বৈশিষ্ট্যগুলি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে কাহিনীতে। কিশোর গায়েব খুব দুরন্ত, তার উৎপাতে পাঠশালার সকল ছেলে অস্থির। গায়েব ক্রমশই ছেলেদের দলের রাজা হয়ে ওঠে এবং তার অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ছেলেরাও তাকে রাজা মেনে নেয়। একটি মাটির টিবির উপর বসে রাজা গায়েব রাজ্য পরিচালনা করে। এমন সময় ছোটো একটা ছেলে নিজেকে রাজার পূজারী মনে করে মন্ত্র পড়ে গায়েবকে রাজটিকা দেওয়ার আয়োজন করে। ছোট্ট রাজ-পূজারী বালক গায়েবকে বাবার নাম জিজ্ঞাসা করে। গায়েব তার বাবার নাম বলতে পারেনি। গায়েব জানতো না সে সূর্যদেবের বরপুত্র। সমস্ত ছেলেরা দেখল তাদের রাজা বাবার নাম জানে না - এটা তাদের কাছে হাস্যকর। এখানেই কিশোর গায়েবের আচরণের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল।

“নাম বলতে পারলেন না, লজ্জায় অধোবদন হলেন চারিদিকে ছেলের পাল হো-হো করে হাততালি দিতে লাগল, লজ্জায় গায়েবের মুখ লাল হয়ে উঠল। তখন এক পদাঘাতে সেই মাটির সিংহাসন চূর্ণ করে চড়-চাপড়ে ছোটো ছেলেদের ফোলাগাল আরও বেশি করে ফুলিয়ে রাগে কাঁপতে-কাঁপতে গায়েব একবারে দেব মন্দিরে উপস্থিত হলেন।”^৫

ইতিপূর্বে গায়েবের যে আচরণ দেখেছি তা কিশোর সুলভ দুরন্ত ও দুষ্টিমিতে ভরা, কৈশোরকালে এরূপ আচরণ স্বাভাবিক। পিতৃপরিচয়হীন রাজাকে নিয়ে প্রজারা যে হাসি-মসকরা শুরু করেছে তা একজন রাজার কাছে রাজোচিত সম্মান নয়। এই ঘটনার পর কিশোর গায়েবের যে আচরণ লেখক দেখিয়েছেন তার কারণ জানতে গেলে মনোবিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হয়।

সুভাগা গায়েবীকে কিভাবে সূর্যদেবের আরাতি করতে হয় তা শেখাচ্ছিল। এমন সময় প্রবেশ করে সূর্যদেবের মঙ্গল আরাতির প্রদীপটা টান মেরে ফেলে দেয়। প্রকাণ্ড পাথরের সূর্যমূর্তি তুলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করে। সুভাগা গায়েবকে নানাভাবে সাহুনা দেওয়ার চেষ্টা করে - বারবার মনে করিয়ে দেয় গায়েবী তোর বোন, আমি তোর মা, পিতার নামে কাজ কি? গায়েবী কাঁদতে কাঁদতে বলে 'তবে কি মা আমি নীচ, জঘন্য, অপবিত্র পথের ধুলো, ভিখারীর অধম?' সুভাগা বারবার বোঝাবার চেষ্টা করে গায়েব গায়েবী নীচ নয়, অপবিত্র নয়, সূর্যের সন্তান, সকলের চেয়ে পবিত্র। গায়েব ক্ষান্ত হবার নয়। বাধ্য হয়ে সুভাগাকে সূর্যদেবকে আহ্বান করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। গায়েবী স্মরণ করিয়ে দেয় সূর্যমন্ত্র উচ্চারণ করে সূর্যদেবকে আহ্বান করলে মাকে ফিরে পাবে না। পিতৃ পরিচয়ের সত্যতা জানতে গেলে মাকে হারাতে হবে এই সত্য জানার পরেও গায়েব নিজ সিদ্ধান্তে স্থির থেকেছে। সূর্যমন্ত্র উচ্চারণের সাথে সাথেই সূর্যদেব দেখা দেন এবং দেখতে দেখতে সূর্যের প্রচন্ড তেজে সুভাগার শরীর জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। গায়েব যখন বুঝলো মা আর নেই আর রাগে দুঃখে চোখে আগুন ছুটল এবং পাথর দিয়ে সূর্যদেবকে ছুড়ে মারে। গায়েবের এরকম আচরণকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় সমস্যামূলক বা অপরাধপরায়ণ (Cause of Delinquency) আচরণ বলে। এ ধরনের সমস্যামূলক আচরণ সৃষ্টির কারণ খুঁজতে গেলে মূল চারটি বিষয়ের উপর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ হয় -

১. পারিবেশিক (গৃহ পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, বৃহত্তর পরিবেশ)
২. সামাজিক
৩. বংশধারামূলক
৪. মনবৈজ্ঞানিক।^৬

যে সমস্ত গৃহপরিবেশে সবসময় অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায় এই সমস্ত পরিবারের শিশু-কিশোরদের আচরণে সমস্যা দেখা যায়। কলহ, মারপিট, উদাসীনতা শিশু-কিশোরদের মধ্যে ঋণাত্মক প্রভাব ফেলে। বিচ্ছেদ, কোন একজনের অনুপস্থিতি, শিশু-কিশোরদের মানসিক সমস্যার কারণ হয়। শিশু-কিশোরদের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অপরিহার্য হলো নিরাপত্তার চাহিদা। প্রাথমিক নিরাপত্তার গড়ে ওঠে মা এবং বাবাকে কেন্দ্র করে। অভিভাবকহীন শিশু-কিশোররা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, যা তাদের আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।^৭ গায়েবের মধ্যে এরকম নিরাপত্তাহীনতা থেকে তৈরি মানসিক সমস্যামূলক আচরণ দেখা যায়। গায়েবের মধ্যে হীনমন্যতা দেখা যায়। নিজের জন্ম সম্পর্কে তার মনে প্রশ্ন জাগে - 'আমি নীচ, জঘন্য, অপবিত্র, পথের ধুলো'।

কৈশোরকালে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে নানা ধরনের চাহিদার সৃষ্টি হয়। সময়ের সাথে সাথে সেই দৈহিক মানসিক চাহিদাগুলোর পূরণ হওয়া আবশ্যিক হয়ে পড়ে। এই চাহিদাগুলোই কিশোর-কিশোরীদের আচরণে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। চাহিদাগুলির পূরণ হলে তাদের আচরণে মধ্যে ধনাত্মক সংলক্ষণ ফুটে ওঠে। চাহিদা পূরণ না হলে সমস্যামূলক আচরণ দেখা যায়। তিন ধরনের মৌলিক চাহিদা আছে। যথা- 'দৈহিক চাহিদা' 'মনোবৈজ্ঞানিক চাহিদা', 'সামাজিক চাহিদা'। 'মনোবৈজ্ঞানিক চাহিদা'র মধ্যে থাকা 'নিরাপত্তার চাহিদা'টি কাহিনীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। নিরাপত্তা শব্দটির অর্থ নিজের স্থানকে সুরক্ষিত করা। প্রত্যেক কিশোর-কিশোরী পারিপার্শ্বিক পরিবেশে নিজের স্থান সম্পর্কে সচেতন থাকে। সমাজ, বন্ধুবর্গের কাছে তার স্থান কতটুকু সেটা তারা খুব ভালো বোঝে। কৈশোররা কখনো চায় না তার স্থান প্রত্যক্ষ্য বা তিরস্কার এর মধ্যদিয়ে নিচে নেমে আসুক। নিরাপত্তার চাহিদার নিবৃত্তি না হলে কিশোর-কিশোরীরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে, নিজের স্থান পুনরায় অধিকার করার জন্য অনৈতিক বা অসামাজিক কাজ করে ফেলে। যতক্ষণ না নিরাপত্তা সুনিশ্চিত না হয় ততক্ষণ আচরণের মধ্যে অসংলগ্নতা লক্ষ্য করা যায়। গায়েবের মধ্যে যে অসংলগ্ন সমস্যামূলক আচরণ আমরা দেখেছি তার অন্যতম কারণ নিরাপত্তাহীনতা। গায়েব সকলের চেয়ে লেখাপড়ায়, শারীরিক সক্ষমতায় এক কথায় সবদিক থেকে এগিয়ে। গায়েবের বন্ধুবর্গ তাকে রাজা বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। গায়েবের স্থান সকলের উপরে। গায়েব

সকলের রাজা, প্রজা-বন্ধুরা তার কথা শুনে উঠে বসে। একজন কিশোরের পক্ষে কম গর্বের কথা না। প্রত্যেক কিশোর নিজের দলে এমন ভাবেই নিজের একটা পাকাপোক্ত জায়গা করে নিতে চায়। এক কথায় সুনিশ্চিত নিরাপত্তা অর্জনে গায়েব সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু গায়েবের স্থানটি খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। গায়েব পিতৃপরিচয় দিতে ব্যর্থ হলে চারিদিকে ছেলের পাল হো-হো করে হাততালি দেয়। যে ছিল ছেলেদের দলের রাজা, এক মুহূর্তেই সে হয়ে উঠল তাদের হাসির খোরাক। এ যেন রাজা থেকে ভিখারি হওয়ার সামিল। এমন অধঃপতন কোনো কিশোরের কাম্য নয়। এখানেই 'নিরাপত্তা চাহিদা'র তত্ত্বটি ক্ষুণ্ণ হল যার প্রত্যক্ষ প্রভাব গায়েবের আচরণের মধ্য ফুটে উঠেছে।

মনোবিজ্ঞানে 'সামাজিক চাহিদা'র অন্তর্গত 'স্বীকৃতির চাহিদা'। 'স্বীকৃতির চাহিদা'র প্রেক্ষাপট হল সামাজ্য। অর্থাৎ কিশোর-কিশোরীরা সমাজের কাছে স্বীকৃতি লাভ করতে চায়। সমাজের মাঝে নিজেকে তুলে ধরতে চায়, নিজের অস্তিত্বকে জাহির করতে চায়। সামাজিক স্বীকৃতি কিশোর-কিশোরীদের নতুন কিছু করার উৎসাহ জাগায় কারণ কর্ম সম্পাদনের দ্বারা তারা সমাজের চোখে নিজের জায়গাটিকে আরো মজবুত করে তোলে। 'স্বীকৃতির চাহিদা' ক্ষুণ্ণ হলে কিশোর-কিশোরীদের মনে অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তখন তারা নিজেদের সংযত করে রাখতে পারে না, অস্বাভাবিক সমস্যামূলক আচরণ করে। গায়েব পাঠশালায় ছেলেদের অস্থির করে, দুঃস্থিমি করে, নিজের অস্তিত্বকে সকলের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করে। গায়েব এখন সকলের রাজা, সকলের দ্বারা স্বীকৃত। কিন্তু গায়েব অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে পারেনি। পাঠশালার পারিপার্শ্বিক সমাজ বা বন্ধু-সমাজে আজ তার অস্তিত্ব সংকটের মুখে কারণ সে পিতৃপরিচয়হীন। একদিকে নিরাপত্তা সংকট এবং অন্যদিকে অস্তিত্ব বা স্বীকৃতির সংকট - এই দুই সংকটে জর্জরিত গায়েব চরিত্রটি। তাইতো বোন গায়েবী এবং মা সুভাগা দুজনেই অনেক চেষ্টার পরেও গায়েবকে শান্ত করতে পারেনি। পিতৃপরিচয় জানার তীব্র কৌতুহল গায়েবকে জেদি এবং ত্রুর করে তুলেছে। মা সুভাগা সূর্যদেবকে আহ্বান করার পূর্বে গায়েবকে স্পষ্ট জানায় পিতৃপরিচয় সে পাবে কিন্তু মাকে হারাবে। নিরাপত্তাহীনতা, অস্তিত্বহীনতা কিশোর গায়েবকে এতটাই কঠিন করে তুলেছিল যে মায়ের মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও নিজের সিদ্ধান্তের স্থির থেকেছে। সূর্যমন্ত্র উচ্চারণের সাথে সাথে গায়েব দেখলো তার মা আর নেই, মা এখন রাশিকৃত ছাই। রাগে-দুঃখে তার চোখে আঙুন ছুটলো এবং একখানা পাথর কুড়িয়ে সূর্য দেবতাকে ছুড়ে মারল। গায়েবের যে একমাত্র আশ্রয় বা অবলম্বন ছিল সেটিও সে হারিয়ে ফেলল। এমত অবস্থায় গায়েবের ত্রুর আচরণ অস্বাভাবিক হলেও তা মনোবিজ্ঞান সম্মত। নিরাপত্তা, অস্তিত্ব, স্বীকৃতি প্রভৃতি মানসিক সংকট থেকে গায়েবের আচরণের মধ্যে হীনমন্যতা হতাশা ত্রুরতার জন্ম দিয়েছে।

কাহিনীর পরবর্তী অংশে দেখি গায়েব সূর্যকুন্ড থেকে উঠে আসা সপ্তাশ্বরথে পৃথিবী জয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে মহানন্দে, গায়েবীকে সূর্যমন্দিরে বন্ধ রেখে। শিলাদিত্য বল্লভীপুরের রাজাকে সংহার করে রাজসিংহাসনে বসে। পাঠশালার সঙ্গীদের কাউকে মন্ত্রী কাউকে বা সেনাপতি করে। শিলাদিত্য চন্দ্রাবতীনগরের রাজকন্যা পুষ্পবতীকে বিয়ে করে। শ্বেতপাথরের শয়ন মন্দিরে বিশ্রাম করতে গেলে বোন গায়েবীর কথা মনে পড়ে। সেদিন ভোরেই শিলাদিত্য বোন গায়েবীর সন্ধানে সূর্য মন্দিরে গিয়ে হাজির হয় কিন্তু খালি হাতে দীর্ঘ নিঃশ্বাস রাজমন্দিরে ফেলে ফিরে আসে।

কিশোর গায়েবের মধ্যে সামাজিক স্বীকৃতির চাহিদা সৃষ্টি হয়েছিল মায়ের মর্মান্তিক মৃত্যুর পরও চাহিদার অবসান হয়নি। আসলে এই ধরনের মনোবিজ্ঞানিক চাহিদাগুলি কখনোই নষ্ট হয় না। চাহিদার পূরণের মধ্য দিয়েই আচরণের সমঞ্জস্যতা আসে। মায়ের মৃত্যুর পর গায়েবের আপনজন বলতে বোন গায়েবী ছাড়া আর কেউ ছিল না। নিজেকে সমাজের চোখে স্বীকৃতি দেওয়া, প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্য শিলাদিত্যকে এতটাই কঠিন করে তুলেছিল যে একমাত্র বোনকে মন্দিরে একা রেখে যেতে একবারও দ্বিধাবোধ করেনি। বল্লভীপুর রাজ্যের রাজা হওয়ার পর শিলাদিত্যের সামাজিক ও মনোবৈজ্ঞানিক চাহিদাগুলি পূরণ হয়েছে। তাই রাজা হওয়ার পরেই বোন গায়েবীর কথা শিলাদিত্যের মনে পড়েছে।

“সেই সময় শিলাদিত্য তার ছোট বোন গায়েবীর কচি মুখখানা স্বপ্নে দেখলেন, তার মনে হল যেন অনেক, অনেক দূর থেকে সেই মুখখানি তার দিকে চেয়ে আছে; আর সেই সূর্য মন্দিরের দিক থেকে কে যেন ডাকছে - ‘ভাইরে, ভাইরে, ভাইরে!’”^৮

স্বপ্নে শিলাদিত্য বোনকে দেখে চিৎকার করে জেগে উঠে। বোন গায়েবীর স্মৃতি এতদিন অন্তরালে অবচেতন স্তরে চলে গেছিল তাই একবারের জন্যেও বোনের কথা শিলাদিত্যের মনে পড়েনি। শিলাদিত্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল নিজেকে

প্রতিষ্ঠিত করা, সমাজের চোখে স্বীকৃতি লাভ করা। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অবচেতন স্তর থেকে হঠাৎ করেই বোনের বোনের স্মৃতি ফিরে আসে। বোনের সাথে কাটানো শৈশবের দিনগুলো শিলাদিত্যের বারবার মনে পড়ে। বোন গায়েবীর খোঁজে শিলাদিত্য সূর্য মন্দিরে গিয়ে পৌঁছায়। শিলাদিত্য প্রকাণ্ড গহ্বর মুখে দাঁড়িয়ে ডাকল ‘গায়েবী! গায়েবী! তার সেই করুণ সুর’। গায়েব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে রাজমন্দিরে ফিরে আসলো। এই দুর্গম বেদনাময় পৃথিবীতে রাজা শিলাদিত্যের আপনজন বলে আর কেউ রইল না। ‘তার সেই করুণ সুর’, ‘গায়েব নিঃশ্বাস ফেলে রাজমন্দিরে ফিরে এলেন’ এই দুটি শব্দবন্ধের দ্বারা শিলাদিত্যের মনের করুণ অবস্থা এবং নতুন মানসিক সংকটের সূচনার অনুমান করতে পারি।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘রাজ কাহিনী’র ‘শিলাদিত্য’ নামে অধ্যায়টিতে বালিকা সুভাগা ও কিশোর শিলাদিত্য ওরফে গায়েব চরিত্র দুটি আলোচনা করলাম। মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে চরিত্র দুটির আচরণ বিশ্লেষণের দ্বারা তাদের মনস্তত্ত্ব বোঝার চেষ্টা করেছি। সুভাগা এবং শিলাদিত্য দুটি চরিত্রই কিশোর মনস্তত্ত্বের প্রেক্ষিতে জীবন্ত হয়ে উঠছে। সুভাগার মৃত্যু কামনার পিছনে রয়েছে কুলহারী এক বালিকার অতীতের জীবনের স্মৃতি, কাম্যজীবন না পাওয়ার বেদনা, আশ্রয়হীনতা। কিশোর গায়েবের চরিত্রের মধ্যে হীনমন্যতা-হতাশা-ক্রুরতা প্রভৃতি যে আচরণগত সমস্যাগুলি দেখানো হয়েছে সেগুলি নিরাপত্তা-অস্তিত্ব-স্বীকৃতি প্রভৃতি মানসিক সংকট (চাহিদা) থেকে সৃষ্টি হয়েছে। ‘শিলাদিত্য’ কাহিনীর চরিত্রগুলি যেরূপ আচরণ করেছে তা কখনোই অহেতুক বা অ-মনস্তাত্ত্বিক বলে মনে হয় না। চরিত্র দুটির অস্বাভাবিক আচরণ বা সমস্যামূলক আচরণকে যুক্তিযুক্ত এবং মনোবৈজ্ঞানিক মনে হয়েছে।

Reference:

১. বিশী, প্রমথনাথ, বাংলা লেখক ও কবি, মাঘ ১৩৬৩, করুণা প্রকাশনী, কল-০৭, পৃ. ৮৪ - ৮৫
২. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্র কিশোর রচনা সমগ্র, জানুয়ারি ২০১৪, আদিত্য পাবলিশার্স, কল-০৯, পৃ. ০৭
৩. তদেব, পৃ. ০৭
৪. তদেব, পৃ. ০৬
৫. তদেব, পৃ. ০৮
৬. ঘোষ, অরুণ, অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান, ষষ্ঠ সং মার্চ ২০০৯, এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজার্স, কল-০৯, পৃ. ১৬৮
৭. রায়চৌধুরী, অরুণকুমার, মানুষের মন, দ্বিতীয় সং চতুর্থ মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৭, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কল-৯১, পৃ. ২২ - ২৫
৮. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্র কিশোর রচনা সমগ্র, জানুয়ারি ২০১৪, আদিত্য পাবলিশার্স, কল-০৯, পৃ. ১০